বেঙ্গল টাইমস

১৬ জুলাই, ২০২৬

জনরোষ নাকি অসভ্যতা?

bengaltimes.in

ISSN 2445 5657

সূচিপত্র

রাজনীতি

আপনার হাতে রইল শুধুই ডিম, ঘোড়ার ডিম

❑ স্বরূপ গোস্বামী

তিন হাজারি ভাণ্ডার সবাই কেন পাবেন?

❑ অজয় কুমার

বাসে ফ্রি! নিয়মে একটু বদল আসুক

❑ স্নেহা সেন

কাকে দিলি রাজার পার্টো

❑ সরল বিশ্বাস

ওপেন ফোরাম

তসলিমাকে হজম করা এই অর্বাচীনদের কম্ম নয়

❑ সৃজন শীল

বিনোদন

থ্রিলার থেকে ফুলপিসি, ঘরানাচ্যুত শিবু–নন্দিতা

❑ বিপ্লব মিশ্র

খেলা

এমন এক্সক্লুসিভ ছবি আর হল কই!

ধীমান সাহা

ভ্রমণ

মেঘ, পাহাড়, নদী, অরণ্য— কী নেই উত্তরবঙ্গে!

❑ তিস্তা ঘোষাল

হোমস্টের নামে রিসর্ট কালচার বন্ধ হোক

❑ উত্তম জানা

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন। সম্পাদকীয় কার্যালয়: কেবি ১২, সেক্টর ৩, সল্টলেক, কলকাতা ১০৬। ফোন: ৯৮৩১২২৭২০১, আইএসএসএন ২৪৪৫ ৫৬৫৭, ওয়েবসাইট www.bengaltimes.in

সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী

সম্পাদকীয়

স্রোতের উল্টোদিকে

রাজনৈতিক পালাবদল হলে তা শুধু রাজনীতিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সর্বস্তরেই ছড়িয়ে যায়। সাহিত্য হোক বা সিনেমা, সমাজ হোক বা খেলাধুলো—এর বিস্তার সর্বত্র। ভোটের মাধ্যমে মানুষ যেমন একটা দলকে প্রত্যাখ্যান করে, তেমনই একটি দলকে বিকল্প হিসেবে ডেকেও আনে। রাজ্যের সাম্প্রতিক জনাদেশ প্রত্যাখ্যানের নাকি আস্থার, তা নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে।

কোনও সন্দেহ নেই, পরিবর্তনের কিছু ইতিবাচক দিক আছে। শিল্পের ক্ষেত্রে, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সদিচ্ছা যেমন দেখা যাচ্ছে, তেমনই উদ্যোগেও ঘাটতি নেই। অন্তত সম্ভাবনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু রাজনৈতিক সংস্কৃতি বদলের তেমন ইঙ্গিত নেই। আগের সরকার যেমন দল ভাঙানোর খেলায় মেতে উঠেছিল, এই সরকার তাকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে। বিরোধী পরিসর ক্রমশ সঙ্কুচিত হচ্ছে। আস্ত বিরোধী দলকেই গিলে ফেলার চেষ্টা। অর্থাৎ, বিরোধী কণ্ঠস্বরকে শাসকই নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। লোকসভা, বিধানসভায় যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, পুরসভা বা পঞ্চায়েতেও সেই গড্ডলিকা প্রবাহই চলবে।

সেইসঙ্গে সুশাসনের নামে থাকছে উগ্র প্রতিহিংসা। যে ডিম থেরাপিকে একসময় জনরোষ বলে দাবি করা হচ্ছিল, ক্রমশ তা নির্লজ্জ এক ইভেন্টে বদলে গেছে। অন্তত এক্ষেত্রে পুলিশ নির্বিকার। আপাতভাবে কেউ কেউ তৃপ্ত হচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু এই প্রবণতা চলতে থাকলে আইন হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা ক্রমশ বাড়বে। এনকাউন্টারের নামে জয়ধ্বনি মূলস্রোত মিডিয়ায়। কিন্তু তা যে প্রকারান্তরে আইন ও প্রশাসনের প্রতি অনাস্থার জমি তৈরি করছে, এই সূক্ষ্ম ফারাকটা এখনই বোধগম্য হওয়ার কথা নয়।

মূলস্রোত গণমাধ্যম তালে তাল দিয়ে যাবে, এটাই দস্তুর। এমনকী বিকল্প ডিজিটাল মিডিয়ার বড় অংশেও এখন ধন্য ধন্য স্তুতি চলবে। কিন্তু ক্ষীণ কণ্ঠে হলেও উল্টো কথাটা বলা জরুরি। ভালকে প্রশংসা করতে যেমন কুণ্ঠা থাকবে না, তেমনই যেখানে বিচ্যুতি, সেখানে আলো ফেলাও সময়ের দাবি।

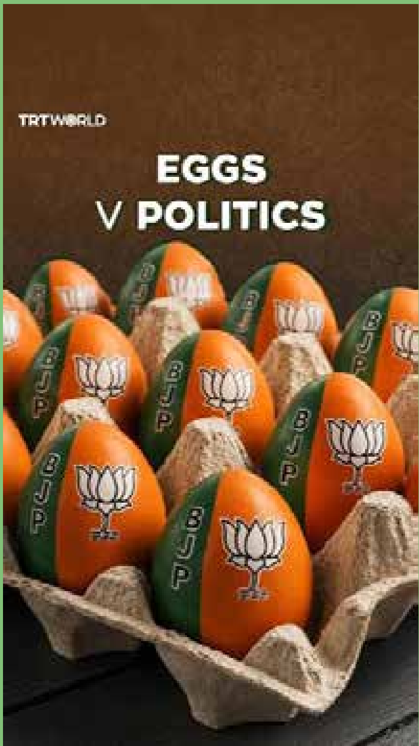

আপনার হাতে রইল শুধুই ডিম, ঘোড়ার ডিম

স্বরূপ গোস্বামী

ডিমের বড়ই দুঃখ। কোনওদিনই সে বেচারা প্রাপ্য মর্যাদা পায়নি। বিয়েবাড়িতে চিকেন, মাটনের কতরকম পদ। এমনকী নানা রকমের মাছের আইটেমও আছে। কিন্তু ডিম! মেনু কার্ডে সে বেচারার ঠাঁই হয় না।

খাঁসির মাংস আটশো টাকা ছাড়িয়ে গেছে। চিকেনও আড়াইশো। যদি নধরকান্তি ইলিশ নিতে যান, অন্তত হাজার টাকা পকেটে রাখুন। চিংড়ি? সে ব্যাটাও পাঁচশো ছাপিয়ে গেছে। অথচ ডিম! তার দাম যদি আট টাকা থেকে সাড়ে আট টাকা হয়ে যায়, গেল গেল রব ওঠে। ডিমের জন্য ওটুকু খরচও করা যাবে না।

কোথাও যাওয়ার আগে ডিম খাওয়া যাবে না। সেটা নাকি অপবিত্র। ডিম খেয়ে গেলে নাকি 'যাত্রা' শুভ হয় না। অথচ, 'শুভ জন্মদিন' লেখা কেক আবার ডিম দিয়েই বানানো।

যাই হোক, ইদানীং ডিমের কদর বেড়েছে। বেড়েছে না কমেছে, সেটা ডিমই জানে। এখন যাকে-তাকে ডিম ছুঁড়ে মারা হচ্ছে। টিভিতে সেইসব দৃশ্য দেখানো হচ্ছে। কেউ কেউ নাম দিয়েছেন ডিম থেরাপি। ডিম নাকি প্রতিবাদের অস্ত্র। এত ব্যবহারে মোমবাতি আজ পুরনো। নতুন কোনও আইটেম চাই। অতএব, ডিম ছোঁড়ো।

প্রথম প্রথম এটাকে জনরোষ বলে চালানো হচ্ছিল। মিডিয়াও ফলাও করে তেমনটাই প্রচার করছিল। কী জানি, হয়তো রাগ ছিলও। এতদিনের পুষে রাখা রাগ যদি ডিম ছুঁড়ে একটু কমে, মন্দ কী! কিন্তু যত দিন গেল, পাবলিক হাওয়া হয়ে গেল। আসলে, পাবলিক বলে চালালে দলে নম্বর বাড়বে না। তাই এখন ডিম ছুড়েই জয় শ্রী রাম স্লোগান। বা রে! এটার ভিডিও করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছাড়তে হবে না! দলের নেতারা যদি ফোন ঘাঁটতে গিয়ে একবার দেখে ফেলেন। অন্তত পঞ্চায়েত বা পুরসভায় টিকিট পাওয়ার দাবিদার তো হওয়া যাবে!

একটু ডিম ছোঁড়ো, আর চোর চোর বলে চিৎকার করো। ফোকটে পাবলিসিটির জন্য আর কী চাই! বেশ একটা 'পোতিবাদী' 'পোতিবাদী' ইমেজ। ঠিক যেন নয়ের দশকের 'পোসেনজিৎ'। বেচারা ডিম! সে একদিকে প্রচারে একটু কল্কে পেল। অন্যদিকে মিড ডে মিল থেকে ভ্যানিশ হয়ে গেল।

আসলে, কারও হেনস্থা হলে আমরা বেশ মজা পাই। তারিয়ে তারিয়ে অন্যের অপদস্থ হওয়া উপভোগ করি। তাই কাউকে ডিম ছোঁড়া হচ্ছে দেখলে বেশ একটা বিকৃত আনন্দ পাই। এই আনন্দ পেতে পেতে জনরোষ যে কবে পলিটিকাল ইভেন্ট হয়ে গেছে, বুঝতেই পারিনি। প্রতিবাদ যে কবে অসভ্যতা হয়ে উঠেছে, টেরই পাইনি।

আসলে, ভক্ত হওয়ার বেশ একটা মজা আছে। নিজেকে বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু ভাবতে হয় না। যুক্তি দিয়ে বিচার করতেও হয় না। হোয়াটসঅ্যাপে যে সব ভিডিও বা লিঙ্ক আসে, সেগুলো দেখলেই হয়। ইউটিউব তো আছেই। একবার ডিম ছোঁড়ার ভিডিও দেখলে বারেবারে সেই লিঙ্কই আসবে।

কারণ, ফেসবুক বা ইউটিউব ততদিনে বুঝে নিয়েছে, আমি এই দৃশ্যই দেখতে চাই। কেউ উল্টো যুক্তি দিচ্ছে! দেশদ্রোহী বলে দাও। লোকে এটাও কিন্তু হেব্বি খাচ্ছে।

আপনি তৃণমূলকে চোর চোর বলে এতদিন গালি পাড়লেন। কোন সময়ে তৃণমূলের কুড়ি জন এম পি দিল্লিতে উড়ে গিয়ে এনডিএ-র শরিক হয়ে গেল, বুঝতেও পারেননি। এতদিন এঁদেরই চোর, দেশদ্রোহী, চটিচাটা—কতকিছুই না বলেছেন। এবার মালা নিয়ে তৈরি থাকুন। শহরে এলেই পরিয়ে দিতে হবে তো! পোশাকি নাম যতই এনডিএ শরিক হোক, আসলে এঁরা বিজেপিই হয়ে পড়েছেন। এখন মিউ মিউ করছেন, দুদিন পর আগের মতোই হুঙ্কার ছাড়বেন।

দিল্লিতে যা হচ্ছে হোক। রাজ্যে তো তৃণমূল জব্দ। ও হরি! সেই তৃণমূলের এমএলএ-রা এখন উঠতে বসতে তৃণমূলকেই গাল পাড়ছে। তাঁরা এখন আপনার থেকেও বড় বিজেপি। এবার কোন মুখে তাঁদের 'চোর' বলবেন! কদিন পর এঁদের বিজেপি নেতা বলে মেনে নেওয়া ছাড়া আপনার কীই বা করার আছে! দিল্লির ক্ষেত্রে না হয় বলেছিলেন, দেশের স্বার্থে, বিল পাসের স্বার্থে নেওয়া হল। রাজ্যের এমএলএ দের দলবদল নিয়ে কী ব্যাখ্যা দেবেন? আপনাকে ভাবতে হবে না। ততদিনে জুতসই একটা ব্যাখ্যা ঠিক দিয়ে দেওয়া হবে। আপনি শুধু মুখস্থ রাখুন। সময় মতো উগরে দেবেন।

দিল্লি গেল। কলকাতাও গেল। বাকি পড়ে রইল কী? আপনার জেলা? আপনার শহর? আপনার গ্রাম? অপেক্ষা করুন, এখানেও তৃণমূলীকরণ ঠিক হয়ে যাবে। দিল্লির দলবদল হয়েছে 'বৃহত্তর' স্বার্থে। এবার না হয় 'ক্ষুদ্রতর' স্বার্থে। সেটা ছিল দেশের স্বার্থে, এটা না হয় হবে গ্রাম বা সংগঠনের স্বার্থে।

আপনার হাতে তাহলে কী রইল! ডিম। আস্ত একটি ঘোড়ার ডিম।

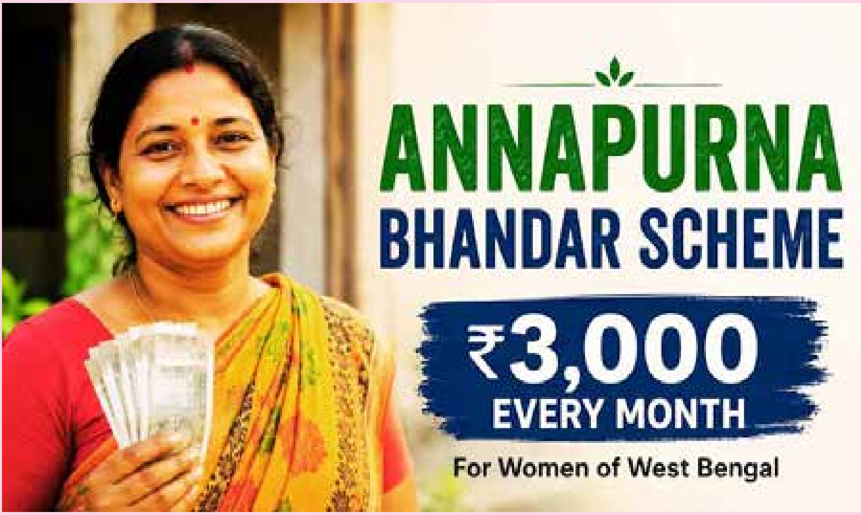

তিনহাজারি ভাণ্ডার সবাই কেন পাবেন?

অজয় কুমার

গ্রাম গঞ্জে অনেক মহিলাই ক্ষুব্ধ। কারণ, অনেকের নাম নাকি অন্নপূর্ণা যোজনায় কাটা গিয়েছে। অনেকেই সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন।

কিন্তু আমার মনে হয়, সরকারি অপ্রিয় হলেও সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে। যাঁর স্বামী আশি হাজার টাকা মাইনে পান, তাঁর স্ত্রীকে বা মেয়েকে কেনই বা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা দেওয়া হবে? যাঁর তিন তলা বাড়ি, বাড়িতে তিনটে এসি মেশিন, দুটো চার চাকা গাড়ি, তাঁরাও কী অবলীলায় লক্ষ্মী ভাণ্ডার নিয়ে এসেছেন। তাঁরাও অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম ফিলাপ করেছিলেন। এভাবে সরকারি অনুদানে ভাগ বসাতে নেই, এই আত্মসম্মান বোধটুকুও তাঁদের ছিল না।

এই প্রকল্প যত না মহিলাদের উন্নয়নের জন্য করা হয়েছিল, তার থেকে অনেক বেশি ছিল ভোট ব্যাঙ্কের তাগিদ। কর্মসংস্থান না হোক, অন্তত মাসে পাঁচশো টাকা যদি মহিলাদের অ্যাকাউন্টে দিতে পারি, তাহলে বছর দাঁড়াল ছয় হাজার। তাতেই যদি মহিলাদের বড় অংশের ভোট পাওয়া যায়, মন্দ কী? ভোটের আগে পাঁচশোর অঙ্ক বেড়ে না হয় হাজার হবে। অন্তত মাসে চল্লিশ হাজার মাইনে দেওয়ার থেকে তো বছরে বারো হাজার দেওয়া ভাল। সরকার যখন দিতে চাইছে, তখন পঞ্চায়েতই বা নাম বাড়ানোয় কার্পণ্য করবে কেন? কোনও ঝাড়াই বাছাই নেই। আবেদন করলেই পাওয়া যাবে। কার দরকার, কার দরকার নেই, সেটা বড় রথা নয়। ভোট বড় বালাই। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধি বা আশা কর্মীরাও অপ্রিয় হতে চাননি। তাই সবার নামের তালিকাই পাঠিয়ে দিতেন। কার আর্থিক অবস্থা কেমন, তার যথার্থ অনুসন্ধান হয়নি।

কিন্তু এতকিছুর পরেও ভোটে কাঙ্ক্ষিত ফল এল না। এমনকী মহিলাদের ভোটও অনেকটাই পড়েছে বিজেপির বাক্সে। এর পেছনেও সেই অঙ্ক। তৃণমূল প্রতিশ্রুতি দিল দেড় হাজারের, আর বিজেপির ঘোষণাপত্রে ফলাও করে বলা হল তিন হাজার। এক লাফে ডাবল। আর কী চাই! লক্ষ্মী ভাণ্ডারের অঙ্কে যে মহিলা ভোট ছিল তৃণমূলের একচেটিয়া, তিন হাজারের টোপে সেই ভোটই হয়ে গেল পদ্মমুখী।

কিন্তু এত মহিলাকে তিন হাজার করে দিতে গেলে ভাঁড়ে মা ভবানী হতে কতক্ষণ। এমনিতেই দেউলিয়া অর্থনীতি, তার ওপর অন্নপূর্ণার বোঝা চাপলে সামাল দিতে বেসামাল হতে হবে। এবার সরকার যে সীমিত সংখ্যক মহিলাকে এই সুবিধা দিচ্ছেন, এটা সত্যিই বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ। এমনিতেই সরকারি ভাণ্ডারে তেমন অর্থের জোগান নেই। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ থমকে আছে। অর্থের অভাবে যথার্থ কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। তার ওপর যদি এই খয়রাতি আরও বাড়তে থাকে, তাহলে রাজ্যের অর্থনীতি আরও ভঙ্গুর হয়ে পড়বে। যাঁদের সত্যিই সরকারি সাহায্য দরকার, সরকার শুধু তাঁদেরই সাহায্য করুক। শুধু তাই নয়, যাঁদের সরকার আর্থিক সাহায্য করছে, তাঁদের কীভাবে কাজে লাগানো যায়, সেটাও ভেবে বের করুন। বিনা পরিশ্রমে অর্থদান সেই মহিলাদের জন্যও সম্মানজনক নয়।

ভোটকেন্দ্রিক ব্যবস্থায় যে কোনও অনুদান আসলে খয়রাতি। মূলত ভোটের কথা ভেবেই এমন প্রকল্প নেওয়া হয়। আগের সরকারও ভোটের কথা ভেবেই লক্ষ্মী ভাণ্ডার চালু করেছিল। তবে পাঁচ বছর ধরে এই প্রকল্প চালিয়ে যাওয়া খুব সহজ ছিল না। সেই কৃতিত্বটা অবশ্যই আগের সরকারের প্রাপ্য। বিজেপির প্রচারেও তিন হাজারের টোপ বারেবারেই দেওয়া হয়েছে। লোকে বিশ্বাসও করেছে। কিন্তু এত মহিলাকে যে তিন হাজারি অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার দেওয়া সম্ভব নয়, এই সত্যিটা তখন ইচ্ছে করেই উহ্য রাখা হয়েছিল। নিশ্চিতভাবেই অনেকে আশাহত হয়েছেন। এখন ভোট হলে রাগে তাঁরা হয়তো উল্টোদিকের বোতাম টিপবেন। তবু বলব, সরকারের সিদ্ধান্ত অপ্রিয় হলেও সময়োচিত।

বাসে ফ্রি! নিয়মে একটু বদল আসুক

স্নেহা সেন

সরকারি বাসে মহিলাদের টিকিট ফ্রি। এটা নিঃসন্দেহে ভাল উদ্যোগ। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, এর অপব্যবহার বাড়ছে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই উপলব্ধি করেছি, এই নিয়ম ক্রমশ কার্যত ব্যুমেরাং হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

প্রথম কথা, মহিলা হলেই ফ্রি কেন হবে? এ তো মহিলাদের একধরনের অসম্মান করা। অনেকের সামর্থ্য আছে। তাঁরা তো ফ্রি না চাইতেই পারেন। তাঁরা তো টাকা দিয়েই যেতে পারেন। যাঁরা সেই অনুদান নিতে চান না, তাঁদের মতামতকেও সম্মান জানানো হোক।

দ্বিতীয়ত, ফ্রি বাসযাত্রার সুযোগ নিয়ে অনেকেই আগাম টিকিট কেটে রাখছেন। কিন্তু পরে দেখা গেল, তিনি

হয়তো যাচ্ছেন না। হয়তো পরপর তিনদিন সকালের বাসে টিকিট কেটে রেখেছেন। কোনও একদিন হয়তো গেলেন। অর্থাৎ, বাকি দুদিনের টিকিট নষ্ট হল। অনেকের ফোনেই এখন একাধিক সিম। বিভিন্ন নম্বর থেকে বুকিং করছেন। বোঝার উপায়ও নেই। অনেকদূর পর্যন্ত সেই সিট ফাঁকাই থাকছে। অথচ, যাঁদের সত্যিই সেদিন যাওয়ার দরকার ছিল, তাঁরা টিকিটই পেলেন না।

আমার প্রস্তাব, আগেই যেন ফ্রি না করা হয়। সেই মহিলা যাত্রী ট্রাভেল করুন। যদি সত্যিই তিনি যান, তাহলে দু-তিন দিন পরে তাঁর অ্যাকাউন্টে টাকা দেওয়া হোক। আর যদি সেই যাত্রী টিকিট কেটেও না যান, তাহলে যেন টাকা ফেরত না দেওয়া হয়। এবং শাস্তি হিসেবে আগামী একমাস বা দু'মাস ওই ফোন নম্বর থেকে আর কোনও টিকিট কাটা যাবে না, এরকম একটা ব্যবস্থা হোক।

শুরু থেকেই যদি নিয়মের এমন অপব্যবহার শুরু হয়, কয়েকমাস পরে তা আরও মারাত্মক জায়গায় পৌঁছে যাবে। তাই পরিবহণ দপ্তরের কাছে অনুরোধ, এই নিয়মের পুনর্বিবেচনা করা হোক। নিয়মের অপব্যবহার রুখতে কিছু সংশোধন আনা হোক।

কাকে দিলি রাজার পার্ট!

সরল বিশ্বাস

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, কাকে দিলি রাজার পার্ট! বাংলার নতুন গ্রন্থাগার মন্ত্রীর কর্মকাণ্ড দেখে সেই প্রবাদটাই বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে।

তিনি দপ্তরের দায়িত্ব নিয়েই ঘোষণা করলেন, 'লাইব্রেরি থেকে মমতা ব্যানার্জির বই সরিয়ে ফেলা হবে।' একেবারে খাসা হেডলাইন হওয়ার মতোই কথা। এসেবারে সাজিয়ে দেওয়া বল। গোলে ঠেললেই হল। রিপোর্টার বা সাব এডিটরদের আর ভাবতেই হল না। একেবারে রেডিমেড হেডলাইন পাওয়া গেল। কী আশ্চর্য, পরের দিন প্রায় সব কাগজেই এই লাইনেই শিরোনাম।

সত্যিই তো, বাংলার লাইব্রেরি ব্যবস্থায় আর কোনও সমস্যাই নেই। শুধু মমতা ব্যানার্জির কয়েকটা বই আছে, এটাই একমাত্র সমস্যা। হ্যাঁ, লাইব্রেরি সম্পর্কে তাঁর এটাই ধারণা। এই ধারণা নিয়েই তিনি শপথ নিয়েছেন। যখন দপ্তর জানতে পারলেন, এই ধারণা নিয়েই ঘটা করে সেজেগুজে প্রেস কনফারেন্স করতে চলে এসেছেন।

আচ্ছা, এই মুহূর্তে কতগুলো লাইব্রেরি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে পড়ে আছে? কতগুলো আংশিক বন্ধ? শূন্যপদ কত? একটা জেলা লাইব্রেরি বা শহর লাইব্রেরিতে কত বই থাকে? দপ্তরের বার্ষিক বাজেট কত? এসব সম্পর্কে কোনও ধারণা আছে? লাইব্রেরিয়ান থাকুক বা নাই থাকুক। লাইব্রেরি না হয় বন্ধই থাকুক। শুধু মমতা ব্যানার্জির বই সরিয়ে দিলেই যাবতীয় সমস্যার সমাধান।

আসলে, লাইব্রেরি দপ্তরটাকে এঁরা হেলাফেলার বিষয় বলেই মনে করা হয়েছে। মমতা ব্যানার্জি যখন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এলেন, লাইব্রেরি মন্ত্রী করলেন আব্দুল করিম চৌধুরিকে। বর্ষীয়ান নেতা। জনপ্রিয় নেতা। কিন্তু ঘটনা হল, এক

লাইনও বাংলা পড়তে পারেন না। যিনি বাংলা পড়তেই পারেন না, তাঁকে দেওয়া হল লাইব্রেরির মতো দপ্তর। এরপর এলেন সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি। লোক জড়ো করা, ঝামেলা বাঁধানো আর হুমকি দেওয়াই যাঁর একমাত্র যোগ্যতা। তিনি সমানে বলে গেলেন, সিপিএম আমলে মার্কস, লেনিনের বই দিয়ে লাইব্রেরি ভর্তি করা হযেছে। এই বুলি আওড়েই দশটা বছর কাটিয়ে দিলেন। না হল লোক নিয়োগ, বন্ধ হল একের পর এক লাইব্রেরি।

এবার নতুন সরকার। শুরু থেকেই বোঝা যাচ্ছে, শিক্ষা বা লাইব্রেরি সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব কী? লাইব্রেরি মন্ত্রী চটকদার শিরোনামটুকুই বোঝেন। হাজার দশেক বইয়ের ভিড়ে যদি মমতা ব্যানার্জির গোটা দশেক বই থেকেও থাকে, কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল? আপনারাও না হয় খান কয়েক মোদির জীবনী, শ্যামাপ্রসাদের জীবনী রাখবেন। না হয় আরএসএসের কিছু বইও থাকল। এবং আপনি চান বা না চান, এসব বই তো ঢুকবেই। তাহলে খামোখা মমতা ব্যানার্জির নামে দোষারোপ কেন?

তৃণমূল জমানায় শোনা যেত, লাইব্রেরিতে নাকি শুধু মার্কস, লেনিনের জীবনী আছে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রদের বই নেই। কতখানি অজ্ঞ হলে এই জাতীয় কথা বলা যায়। আসলে, এঁদের সঙ্গে লাইব্রেরির ততটাই সম্পর্ক উগান্ডার লোকের সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতের যতখানি সম্পর্ক। নতুন লাইব্রেরি মন্ত্রীও যে ব্যতিক্রম নন, প্রথম ইনিংসেই বুঝিয়ে দিয়েছেন।

আচ্ছা, লাইব্রেরি দপ্তরের জন্য যথার্থ শিক্ষত, বই মনস্ক লোকের কি সত্যিই এত অভাব? এই দপ্তরটাকে আস্তাকুঁড় ভেবে নেওয়া কি খুব জরুরি? মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে বলতে ইচ্ছে করে, কাকে দিলেন রাজার পার্ট?

তসলিমাকে হজম করা এই অর্বাচীনদের কম্ম নয়

সৃজন শীল

কয়েকদিন ধরেই আবার বাংলার প্রচার মাধ্যমে শিরোনামে উঠে আসছেন তসলিমা নাসরিন। আবার তিনি কলকাতায় আসছেন। আর তাই নিয়ে শুরু হয়ে গেছে রাজনৈতিক চাপানোতর।

তসলিমার কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়া নিঃসন্দেহে দুঃখের। যেভাবে একশ্রেণির মৌলবাদি হামলা চালিয়েছিল, যেভাবে কলকাতাকে অশান্ত করে তুলেছিল, তা কলকাতার গৌরবে অনেকটাই কালি ছিটিয়েছিল।

কিন্তু সেই সময় এমনই একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তসলিমা কলকাতায় থাকলে তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে সমস্যা তৈরি হতে পারত। কোনও সরকারই চায় না আইন

শৃঙ্খলা নিয়ে অরাজকতা তৈরি হোক। মোলবাদি শক্তি সেই সময় ছিল, এই সময় নেই, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। তখন মৌলবাদের চেহারা ছিল অন্যরকম, এখন বড়জোর তার চেহারাটা পাল্টেছে।

কেন তসলিমার বই নিষিদ্ধ হয়েছিল? না, সরকার বিরোধী কোনও লেখার জন্য নয়। বাম সরকারের বিরুদ্ধে তিনি নানা সময়েই সোচ্চার হয়েছেন। তার জন্য তাঁর লেখা নিষিদ্ধ হওয়া তো দূরের কথা, তাঁর বই বিক্রি বা বিভিন্ন কাগজে কলাম লেখাও আটকায়নি। কিন্তু তাঁর একটি বইয়ে বাংলার সাহিত্যিকদের সম্পর্কে নানা আপত্তিকর মন্তব্য ছিল। সেইসঙ্গে ধর্মীয় উস্কানি তো ছিলই। সরকার স্বতপ্রণোদিত হয়ে সেই বই নিষিদ্ধ করেছিল, এমন নয়। শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার-সহ বিভিন্ন দিকপাল মানুষদের মতামত চাওয়া হয়েছিল। তাঁরাও মনে করেছিলেন, এইজাতীয় মন্তব্য রাজ্যের ও শহরের সম্প্রীতির পরিবেশকে নষ্ট করতে পারে।

কোনও বই নিষিদ্ধ হলে তার জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। এটা যে সরকার জানত না, এমন নয়। তবু এমন স্পর্শকাতর বিষয় আরও বড় অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াক, তা কেউই চাইবে না। এমনিতেই রিজওয়ানুরের ঘটনা নিয়ে তখন মহানগর উত্তাল। নানা জায়গায় আন্দোলনের নামে চলছে ভাঙচুর। কাজে লাগানো হচ্ছে মৌলবাদি শক্তিকে। সেই সময় যে কোনও কারণেই হোক, প্রশাসনের সেই দৃঢ়তা ছিল না যে এই শক্তির মোকাবিলা করবে। একটা ছোট্ট অশান্তি থেকে আবার স্ফূলিঙ্গ তৈরি হতে পারত।

যে কারণে, গত পনেরো বছরেও তাঁকে বাংলায় আসতে দেওয়া হয়নি। গত পনেরো বছর তো বাম সরকার নেই। তাহলে সমস্যা কোথায় ছিল? তসলিমা আসছেন, ভাল কথা। কিন্তু এটা নিয়ে বিজেপির খুব একটা উল্লসিত হওয়ার জায়গা নেই। যেহেতু তসলিমা বাংলাদেশের প্রশাসনের বিরুদ্ধে বলেন, তাই বিজেপির কারও কারও মধ্যে খুব উৎসাহ। আসলে, তাঁরা তসলিমার লেখা পড়েননি। নইলে জানতেন, হিন্দু মৌলবাদ নিয়েও তিনি একইরকম সোচ্চার। তাঁর লজ্জা উপন্যাসে যেমন হিন্দু পরিবারের কোণঠাসা হওয়ার কাহিনি আছে, তেমনই ভারতের কোন ঘটনা থেকে বাংলাদেশে আগুন জ্বলে উঠল, সেই কথাও আছে। দুই উস্কানির বিরুদ্ধেই সমান ঘৃণা বর্ষিত হয়েছে তাঁর লেখায়।

তাই যাঁরা উল্লসিত হচ্ছেন, যাঁরা এই সুযোগে আরও একবার বামেদের গাল পেড়ে নিচ্ছেন, তাঁরা বোধ হয় তসলিমার একটি বইও পড়েননি। ধর্মীয় হিংসা ছড়ানোই যাঁদের হাতিয়ার, তসলিমাকে হজম করা তাঁদের কম্ম নয়।

থ্রিলার থেকে ফুলপিসি, ঘরানাচ্যুত শিবু–নন্দিতা

বিপ্লব মিশ্র

বেশ প্রত্যাশা জাগিয়েই শুরু করেছিলেন। দারুণ সাফল্যও এসেছিল। সাফল্য অনেকেরই মাথা ঘুরিয়ে দেয়। বাংলার পরিচালক জুটি এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম নয়।

যে পরিচালকদের কথা বলা হচ্ছে, তাঁরা নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। নন্দিতা মূলত চিত্রনাট্যের দিকটা দেখেন। প্রচার বা প্রোমোশন থেকে দূরেই থাকেন। তুলনায় শিবপ্রসাদ অনেক বেশি পরিচিত।

শুরু সেই মুক্তধারা দিয়ে। ইচ্ছে, রংধনু হয়ে চাপ ফেলে দেওয়া 'বেলাশেষে'। বাঙালির মনে স্থায়ী আসন করে নেওয়া বলতে যা বোঝায়, অনেকটাই তাই। সেই সত্যজিৎ রায়ের 'ঘরে বাইরে'র পর আবার একসঙ্গে সৌমিত্র–স্বাতীলেখা। অনবদ্য ভাবনা, চমৎকার রূপায়ণ। এল ব্লকব্লাস্টার হিট 'প্রাক্তন'। দীর্ঘদিন পর জুটি বাঁধলেন প্রসেনজিৎ–ঋতুপর্ণা। কখনও হামি, কখনও পোস্ত। কখনও গোত্র, কখনও কণ্ঠ। বেশ চালিয়েই খেলছিলেন।

হঠাৎ কী যে হল! বানাতে গেলেন থ্রিলার। রক্তবীজ, বহুরূপী, রক্তবীজ ২।

পথভ্রষ্ট বলতে যা বোঝায়, তাই। সবার দ্বারা যে সবটা হয় না, এই সহজ সত্যিটা কেন যে বুঝলেন না! এবার এনেছেন ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড। অন্য ঘরানার। কিছুটা গোয়েন্দা কাহিনির গন্ধ আছে। নারীদের প্রাধান্য আছে। কিন্তু গল্পটা একেবারেই দানা বাঁধল না।

শুধুতেই দেখা যাচ্ছে এক জমিদারের মৃত্যু। স্বাভাবিক মৃত্যু নাকি খুন! এই নিয়েই চিত্রনাট্য এগিয়ে চলল। কখনও চেনা কক্ষপথে, কখনও আজগুবি গোলকধাঁধায়। আর এই গোলকধাঁধাতেই পথ হারাল ছবিটা। পরে জট ছাড়াতে হবে বলেই যেন ইচ্ছাকৃত জট লাগানো হল। ফুলপিসি হিসেবে সোহিনীর অভিনয় কিছুটা উতরে দিয়েছে। কমিক রিলিপ হিসেবে থানার দারোগা রজতাভর উপস্থিতি কিছু বাড়তি বিনোদন আনে। গ্রামের লম্পট জমিদার ও সেই জমিদারবাড়ির কেচ্ছা নিয়ে কম সাহিত্য বা কম সিনেমা নেই। কিন্তু এই ২০২৬ এ দাঁড়িয়ে এমন পটভূমি কিছুটা যেন বিরক্তি এনে দেয়। বিশেষ করে যাঁরা বেলাশেষে বা প্রাক্তনের মতো ছবি বানান, তাঁদের কাছে এই জাতীয় ছবি প্রত্যাশিত নয়। এমনকী গতবছর এই সময় যে ‘আমার বস’ বানিয়েছিলেন, তার ধারেকাছেও নয়।

তবু ভাল, থ্রিলার থেকে অন্তত বেরিয়ে এসেছেন।

সবার একটা নিজস্ব ঘরানা আছে। যে শট বৈভব সূর্যবংশীকে মানায়, তা কখনই চেতেশ্বর পুজারাকে মানায় না। যে শট বীরেন্দ্র শেহবাগ খেলতেন, সেটা কি রাহুল দ্রাবিড়কে মানাত? শিবু–নন্দিতা জুটি বাংলা ছবির সম্পদ। কিন্তু বৈচিত্র আনতে গিয়ে তাঁরা নিজেদের খাটোই করেছেন। আবার নিজের ঘরানায় ফিরে আসুন।

বাংলা সাহিত্যের সিধু জ্যাঠা

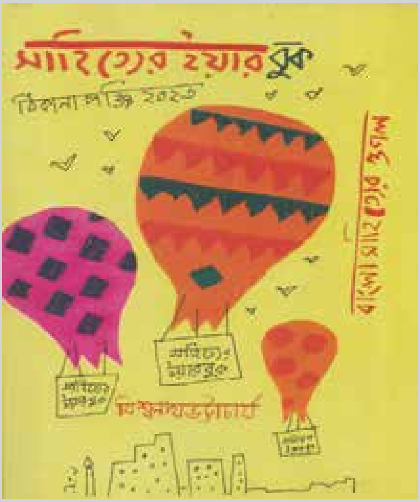

সাহিত্য নিয়ে যাঁদের কোনও আগ্রহ নেই, কোনও লেখক সম্পর্কে যাঁদের কোনও আগ্রহ নেই, তাঁদের এই বই কোনও কাজে লাগবে না।

কিন্তু যাঁরা সাহিত্য ভালবাসেন, সাহিত্যিকদের ভালবাসেন, তাদের চিঠি লিখতে বা ফোনে কথা বলতে চান, কোনও নতুন বইয়ের হদিশ চান, তাঁদের সংগ্রহে এই বই অবশ্যই থাকা উচিত।

নতুন কোনও বই নয়। সাহিত্যের ইয়ারবুক। বাংলা সাহিত্যপ্রেমী মানুষদের কাছে নামটা অজানা নয়। দেখতে দেখতে প্রায় আড়াই দশক হতে চলল। প্রতিবছর হাজির হয় নতুন আঙ্গিকে। সাহিত্যিক ও অধ্যাপক জাহিরুল হাসান প্রথম চালু করেন ২০০২ সালে। অনেক পরিশ্রম করে বিভিন্ন সাহিত্যিকদের ঠিকানা, ফোন নম্বর এসব জোগাড় করেন। বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা থেকে শুরু করে ওয়েবসাইট।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আধুনিক করে তুলেছে এই ইয়ারবুক। প্রত্যন্ত গ্রামের কোনও কবির সঙ্গে সংযোগ ঘটে যাচ্ছে সুদূর ইউরোপ বা আমেরিকায় থাকা কোনও প্রবাসী লেখকের। নীরবে যেন সেতুবন্ধনের কাজ করে চলেছে এই সংকলন।

কত লেখকের ফোন নম্বর বদলে গেছে। ঠিকানা বদলে গেছে। অনেকে মারা গেছেন। অনেক নতুন লেখক উঠে এসেছেন। কত নতুন প্রকাশনা সংস্থা এগিয়ে আসছে। কত নতুন নতুন পত্রিকা, ওয়েবসাইট তৈরি হচ্ছে। কত পত্রিকা অকালেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কত কবির মৃত্যু হচ্ছে। এতকিছুর সঙ্গে সারা বছর জড়িয়ে থাকা সহজ ব্যাপার নয়। অনেক নিষ্ঠার দরকার হয়। সারা বছর ধরেই নিষ্ঠার সঙ্গে কাজটি করে চলেছেন বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। সাহিত্যপ্রেমীদের কাছে এক কথায় মুশকিল আসান।

নাম হয়ে গেছে সাহিত্যের গুগল। কেউ কেউ বলেন সিধু জ্যাঠা। একটা বই, একসঙ্গে এতকিছুর সন্ধান দিতে পারে! যাঁর আছে, তাঁর কাছে এটি অমূল্য সম্পদ। যাঁর নেই, তিনি জানেনও না, কতকিছু থেকে তিনি বঞ্চিত।

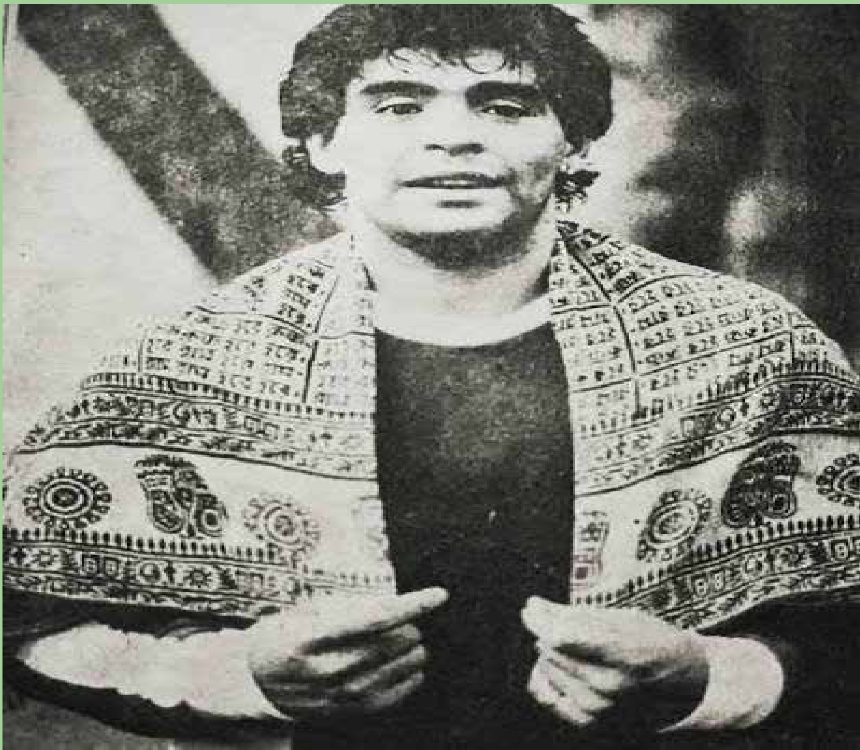

এমন এক্সক্লুসিভ ছবি আর হল কই!

ধীমান সাহা

ঠিক চল্লিশ বছর আগের কথা। তখনও টেলিভিশন সেভাবে ছড়িয়ে পড়েনি। টিভি তখনও উচ্চবিত্তের বেড়া ডিঙিয়ে মধ্যবিত্তের ঘরে আসেনি। যাঁদের ছাদে অ্যান্টেনা টাঙানো, তাঁদের দেখে কেমন একটা সমীহই হত।

তখন বিশ্বকাপ মানে অল্পলোকই তার খোঁজখবর রাখতেন। পাড়ায় কারও বাড়িতে বা ক্লাবে গিয়ে খেলা দেখা। সেবার বিশ্বকাপের আয়োজক ছিল মেক্সিকো। ফলে, সেবারও খেলা হত মাঝরাতেই।

তখন জানার মাধ্যম ছিল খবরের কাগজ। কিন্তু ফাইনালের সকালে কাগজ খুল চক্ষু ছানাবড়া হওয়ার জোগাড়। যা দেখছি, ঠিক দেখছি তো? আজকালের প্রথম পাতায় মারাদোনার বিশাল ছবি। ফাইনালে আর্জেন্টিনা খেলছে। মারাদোনার ছবি থাকবে না তো কার ছবি থাকবে? এর মধ্যে অবাক হওয়ার কী আছে?

আসলে, মারাদোনার গায়ে সেদিন ছিল একটি নামাবলি। যাতে পরিষ্কার বাংলায় লেখা 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ'। এখনকার সময় হলে নির্ঘাত বলা হত, এআই দিয়ে বানানো ছবি। কিন্তু সেই ছিয়াশি সাল। এআই তো দূরের কথা, তখন ইন্টারনেট, ইমেল এই শব্দগুলোই আবিষ্কার হয়নি। ডুপ্লিকেট ছবি বানানোর এতরকম ফন্দিফিকিরও লোকের জানা ছিল না।

তাহলে কি ছবিটা ভেজাল? আজ্ঞে না, একেবারেই খাঁটি। মারাদোনা সত্যিই নামাবলি পরেছিলেন। যাতে সত্যিই বাংলায় লেখা ছিল 'হরে রাম, হরে কৃষ্ণ'।

একজনের কথা উল্লেখ করতেই হবে। অমিয় তরফদার। দিকপাল ফটোগ্রাফার। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর তোলা একের পর এক ছবি ইতিহাস হয়ে আছে। কত জাতীয়, আন্তর্জাতিক ইভেন্ট কভার করেছেন। তিনি সেবার মেক্সিকো গিয়েছিলেন ফ্রিলান্স ফটোগ্রাফার হিসেবে। তাঁর তোলা ছবি যেমন ইংরাজি কাগজে ছাপা হত, তেমনই বাংলার কাগজের মধ্যে ছবি ছাপা হত আজকালে।

বিশ্বকাপে যাওয়ার আগে তিনি গিয়েছিলেন কেঁদুলির জয়দেব মেলায়। সেখান থেকে কিনেছিলেন দুটি নামাবলি। একটি তাঁর মায়ের জন্য। অন্যটি ব্যাগে ভরে নিয়ে গিয়েছিলেন মেক্সিকোয়। ইচ্ছে ছিল, কোনও দিকপাল ফুটবলারকে সেই নামাবলি পরিয়ে ছবি তুলবেন।

তখন নিরাপত্তার এত কড়াকড়ি ছিল না। কিন্তু তারকাদের কাছে ঘেঁসা এত সহজও ছিল না। মারাদোনা তাঁকে মুখচেনা চিনতেন। চোখে চোখেই অনেক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি নিরাপত্তার দুর্গ ভেদ করে মারাদোনার কাছে পৌঁছেও গিয়েছিলেন। একটু আবদার করতেই মারাদোনা রাজি। পেলে বা অন্য কেউ হয়তো রাজি নাও হতে পারতেন। কিন্তু মারাদোনা বরাবরই মোস্ট আনপ্রেডিক্টেবল। কখন কী করে বসবেন, কেউ জানে না। কখনও তিনি বিদ্রোহী, আবার কখনও শিশুর মতোই সরল।

মারাদোনা সরল মনে সেই নামাবলি পরেও নিলেন। ছবি উঠল। সেই ছবি থেকে গেল ইতিহাস হয়ে। ছবিটা যেমন থেকে গেল, তেমনই অমরত্ব পেয়ে গেলেন অমিয় তরফদারও। আজ বিশ্বকাপের আঙিনায় এত রিপোর্টার, এত ফটোগ্রাফার। কিন্তু এমন এক্সক্লুসিভ ছবি আর হল কই!

মেঘ, পাহাড়, নদী, অরণ্য– কী নেই উত্তরবঙ্গে?

তিস্তা ঘোষাল

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া।

আমাদের হয়েছে সেই অবস্থা। আমরা নিজের ঘরকেই ভাল করে চিনিনি। চেনার চেষ্টাও করিনি। পুজো আসছে। বাঙালি ব্যাগপত্তর গুছিয়ে বেরিয়ে পড়বে। কেউ ভিনদেশে, কেউ ভিনরাজ্যে। অথচ, নিজের রাজ্যেই কত ভাল ভাল জায়গা আছে। আমরা খোঁজই রাখি না।

আমার বাড়ি উত্তরবঙ্গে। সেখানেই জন্ম, সেখানেই বেড়ে ওঠা। কিন্তু এই বৈচিত্র্যপূর্ণ উত্তরবঙ্গের কতটুকুই বা জানি! মেয়েদের একটা মস্ত সমস্যা, ইচ্ছে থাকলেও উপায় হয় না। নানা

বিধিনিষেধ এসে পড়ে। ভাবতে অবাক লাগে, আমার অনেক বন্ধুই উত্তরবঙ্গে প্রায় ঘোরেনি বললেই চলে। ঘরের কাছেই ডুয়ার্স। আমরা কজন গেছি? গেলেও হয়ত সারাজীবনে একবার বা দুবার। কাছেই পাহাড়। কত সুন্দর সুন্দর গ্রাম। হয়ত দার্জিলিং অনেকেই গেছেন, কিন্তু সেই গ্রামগুলো? অনেকেই যাননি।

সরকার উত্তরবঙ্গকে গুরুত্ব দিচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বারবার আসছেন। এটা অবশ্যই ভাল একটা উদ্যোগ। নতুন নতুন পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। কিন্তু সেগুলিকে জনপ্রিয় করতে আরও প্রচার দরকার। শুধু সরকারের নয়, আমাদেরও কিছুটা দায় আছে। আমরাও আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারি। সেটা কীভাবে?

আমরা অনেকেই ফেসবুক, হোয়াটস আপ ব্যবহার করি। বাইরে বাইরে বন্ধুরা ছড়িয়ে আছেন। আমরা যদি নিজেদের প্রোফাইলে রোজ উত্তরবঙ্গের একটা করে সুন্দর ছবি পোস্ট করি, তাহলে তা অন্যান্য বন্ধুদেরও নজরে পড়বে। রোজ উত্তরবঙ্গের অজানা সব জায়গা দেখে তারাও আকৃষ্ট হতে পারেন।

যিনি হয়ত দক্ষিণ ভারত যাবেন বলে ভাবছেন, তিনি উত্তরবঙ্গেও আসতে পারেন। এতে এইসব জায়গাগুলো আরও জনপ্রিয় হবে। কারণ, যাঁরা ঘুরে যাবেন, তাঁরা তাঁদের বন্ধুদের বলবেন। তাঁরাও সোশাল মিডিয়ায় প্রচার করবেন।

বিষয়টা ভেবে দেখতে পারেন। আমার বন্ধুদের অনুরোধ, আপনারাও নিজেদের ওয়ালে উত্তরবঙ্গকে তুলে ধরুন। অন্য কেউ ভাল ছবি পোট করলে নিজের ওয়ালে তা শেয়ার করুন। এইভাবেই আমরা একটু একটু করে এগিয়ে দিতে পারি আমাদের প্রিয় উত্তরবঙ্গকে।

হোম স্টের নামে রিসর্ট কালচার বন্ধ হোক

উত্তম জানা

কয়েকমাস আগে গিয়েছিলাম পাহাড়ে। বছরে দুই থেকে তিনবার উত্তরবঙ্গে যাওয়াটা বহুদিনের অভ্যেস। শহর নয়, পাহাড়ি গ্রামগুলোই আরও বেশি করে টানে। গ্রামের স্নিগ্ধতা, নির্জন প্রকৃতি যেন মন ভাল করে দেয়। ঝাঁ চকচকে হোটেল বা রিসর্ট নয়, পাহাড়ি মানুষদের আতিথেয়তা যেন মন ছুঁয়ে যায়।

কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে অদ্ভুত একটা প্রবণতা লক্ষ করছি। হোম স্টের নামে গজিয়ে উঠেছে বিশাল ইমারত। সেগুলি হোম স্টে না বলে হোটেল বলাই ভাল। একটু খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি, সেইসব হোম স্টের সঙ্গে পাহাড়ি মানুষের তেমন সংযোগ নেই। যাঁরা সেগুলিতে বিনিয়োগ করেছেন, তাঁরা কলকাতা বা আশেপাশের লোক।

হাতে অঢেল পয়সা। ব্যাঙ্কে রাখা যাবে না। পাহাড়ের জমি লিজ নিয়ে সেখানে একটা হোটেল বানিয়ে দাও। পর্যটনের সঙ্গে বা পাহাড়ি সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগসূত্রই নেই। তাঁরা সোশ্যাল মিডিয়ায় ঢালাও প্রচার করছেন। অনেকে বুঝে হোক না বুঝে হোক, চলেও যাচ্ছেন। পর্যটকদের মনোরঞ্জনের জন্য কোথাও ডিজে বাজছে। কোথাও সুইমিং পুলের ধারে উদ্দাম নৃত্য চলছে। কোথাও ঢালাও সুরাপানের আয়োজন। এছাড়াও এমন কিছু কর্মকাণ্ড চলছে, যা শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এমনকী খাদ্যতালিকায় পাহাড়ি খাবার নয়। বিরিয়ানি, মোগলাই ঢুকে পড়ছে।

মোদ্দা কথা, পাহাড়ের যে পরিবেশ, তা নষ্ট হচ্ছে। এই সব পর্যটকদের আচরণে স্থানীয় মানুষেরা বেশ বিরক্তই হচ্ছেন। স্থানীয় পাহাড়ি মানুষদের সেখানে কেয়ারটেকার বা রাঁধুনি রাখা হয়েছে। কলকাতার বিভিন্ন ট্যুর অপারেটররা লোক পাঠাচ্ছেন। তাঁরা সেখানে গিয়ে হুল্লোড় করছেন। কখনও শিলিগুড়িতে নেমে বাসভর্তি পর্যটক ডিজে বাজিয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন সেইসব গ্রামে। এমনকী পাহাড়ি খাবারের বদলে বিরিয়ানি, মোগলাই, কাবাব— এসব মেনুতে ঢুকে পড়ছে।

গত কয়েক বছরে বিভিন্ন গ্রামেই এমন ছবি দেখা যাচ্ছে। এতে সেইসব গ্রামের নির্জনতা, স্নিগ্ধতা নষ্ট হচ্ছে। পাহাড়ের নিজস্বতাই হারিয়ে যাচ্ছে। নতুন পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ একজন শিক্ষিত ও উদ্যমী মানুষ। পাহাড়ের পর্যটনকে আরও সুন্দর করে তুলতে নিশ্চয় তিনি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন। হোম স্টের নামে শহুরে পর্যটন ব্যবসায়ীরা যে বেলেল্লাপনার আয়োজন করেছেন, আশা করি তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন। পাহাড়ি গ্রাম পাহাড়ি মানুষের হাতেই থাকুক। তাঁদের প্রশিক্ষণ দিয়ে, প্রয়োজনে সরকারি অনুদান বা ঋণ দিয়ে হোম স্টে কে আরও আকর্ষণীয় করা হোক। কিন্তু শহুরে ট্যুর অপারেটর ও হোটেল মালিকদের প্রবেশ সেখানে বন্ধ হোক।

বেঙ্গল টাইমস

১৬ জুলাই, ২০২৬

bengaltimes.in ISSN 2445 5657